বুদ্ধের বিধান ও আরণ্যক-সংস্কৃতির ছায়াপথ

সুনীতিকুমার পাঠক, শান্তিনিকেতন
(বৌদ্ধ দর্শন ও তিব্বতি ভাষা বিশেষজ্ঞ)

ভারতবর্ষে অরণ্য ঃ

সেকালের ভারতবর্ষ বলতে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ। সব রাষ্ট্রে কমবেশি অরণ্য সম্পদ বিদ্যমান। তবে ভারত উপদ্বীপের দু-তিন দিকে সাগর থাকায় দক্ষিণ ভারতে অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্বত পেরিয়ে প্রাচীন গ্রানাইট পাথরের মালভূমির দুই পাশে অরণ্যের অভাব আজও নাই। যদিও বিশ্বায়নের পথে ভারতে কলকারখানায় উন্নয়নসুলভ বিকাশে অনেকক্ষেত্রে অরণ্য-সীমা সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। জন্তু-জানোয়ারের অভয়ারণ্য সঙ্কীর্ণ হয়েছে— আদর্শ গ্রামের মত, আদর্শ অরণ্য একদিন সেই প্রাচীন অরণ্যের সাক্ষী হিসাবে ম্লান হয়ে যাবে— টুরিস্টস্ রিসর্ট।

কেননা, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির যে-কয়েকটি বলয়রেখা গড়ে উঠেছে তাতে আরণ্যক সংস্কৃতি আজও একটা সমান্তরাল রৈখিক বিশেষত্বের দাবি রাখে। তা হিমালয়ের প্রত্যন্তদেশে অসমতল সুউচ্চ পর্বতগাত্রের অরণ্য হোক; অথবা মধ্য ভারতের বিন্ধ্য পর্বতের সুগভীর জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা হোক; অথবা পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালার সানুদেশের গভীর অরণ্যভূমি হোক। তারা আজও আপন আপন বিশেষত্বে অনড়।

আর ওই সকল অরণ্যের অধিবাসীজনেরা, যারা আজও মেইন স্ট্রিমের ধারে পাশে আসতে চায় না। তারা স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর থাকতে চায়। কেন চায়, তারা মুখ ফুটে বলে না— তবু নিজেরা থাকে নিজেদের মত করে। তাদের সেই উদারতার পিছনে আছে সুনির্দিষ্ট বিশেষ জীবন-শৈলী, যা ছায়াপথের আলেখ্য।

আরণ্যক জনবসতি ঃ

অরণ্য কথাটার পিছনে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। তলিয়ে দেখলে, ভারতবর্ষের মানুষেরা যেদিন আগুন জ্বালতে শিখেছিল সেদিন থেকে তারা 'অরণি' শব্দের ব্যবহার করেছিল। ঋগ্‌বেদে সে কথা মেলে। মানুষ যেদিন দু'টুকরো কাঠ ঘষতে ঘষতে আগুনের ফুলকি পেয়েছিল, সেদিন বোধ করি মানুষের কাছে অরণ্যের দাম বেড়েছিল। ঋগ্‌বেদে তাই অরণ্যানীকে ঋষি 'দেবমুনি' প্রশ্ন করেছিলেন, হে বৃহৎ অরণ্য, তুমি কত দূরে যেন অন্তর্হিত হয়ে যাও, গ্রামের কথা তো বল না? (অরণ্যা ন্যারণ্যান্যু সো বা প্রেব নশ্যসি। কথা গ্রামং পৃচ্ছসি, ন ত্বা ভীরিতি বিন্দতী।। ১০/১৪৬/১) তোমাকে ভয় লাগে না।

কেননা, অরণ্য তো মানুষের ঘনিষ্ঠ। সেখানে আলো আঁধারের খেলা চলে। কোথাও যেন (মনে হয়) গাভী চরে, কোথাও যেন অট্টালিকা (বেশ্ম), সন্ধ্যেবেলায় যেন শকটগুলি চলছে! (উত গাব ধবাদন্ত্যত বেশ্মেব দৃশ্যতো উতো অরণ্যাণিঃ সায়ং শকটারিব সর্জন্তী।। ১০/১৪৬/৩)

স্পষ্ট যে, অরণ্য মানুষের ভয়ের নয়, কৌতূহলের। সেখানের বাসিন্দাজনেরা নিজেরা নিজেদের মত করে চলে। তারা গ্রামের পথ জানতে চায় না। তারা কৃষিনির্ভর সমাজ গড়ে তুলতে অভ্যস্ত নয়। স্বয়ংভর তাদের বনজ উপাচারে।

ভারতবর্ষের পুরাতন পরিচয় ছিল জম্বুদ্বীপ— জম্বু এক ধরনের গাছ। তার ফল হত জামের মত ধরা হয়। রামায়ণে জম্বুর কথা উঠে এসেছে। কেননা, দক্ষিণ ভারতের গ্র্যানাইট শিলা ভূত্বকের অন্যতম প্রাচীন। সে তুলনায় উত্তর ভারতে অর্থাৎ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ উচ্চতা থেকে সানুদেশের ওপর দিয়ে সাগর অভিমুখী গঙ্গা যমুনা গোমতী গণ্ডুকী এমন কি ব্রহ্মপুত্র মেঘনার পলিমাটি সমতলে অরণ্যানী গজিয়ে ওঠেনি তেমন গভীরতর।

তাই আরণ্যক জনবসতি বিন্ধ্যাচল থেকে বিভিন্ন ভাবে গজিয়ে উঠেছে। আর, হিমালয়ের সানুদেশে যতটা নিবিড় আজও তা অন্যত্র নয়। তারা কারা? প্রত্নভাষাবিদরা বলেন, তারা প্রাগ্-আর্য ভারতবর্ষের প্রাচীন জন। মোন্-খেমর-মুণ্ডা, খসী ও শবর গোষ্ঠীর জন।

ভারতীয় জীবনবোধের ধারা

গ্রামেই থাকুক, নগরেই থাকুক, নিগমেই থাকুক, এমনকি যারা অরণ্যে থাকে সবাই জীবনবোধের আপন আপন ভাগীদার। তাই সেকালের ভারতবর্ষের মানুষেরা জীবনের দুই দিকে সমান বোধের অংশ নিরূপণ করেছিল। সেখানে কোনো বর্ণবিচার থাকেনি। ওই দুই দিক ছিল, 'অভ্যুদয়' ও নিঃশ্রেয়স্।

'অভ্যুদয়' শব্দটি আজ প্রায় অচল। সে জায়গায় উদয়ের পথে কথাটা অনেকের কাছে বোঝা সহজ। প্রতি মানুষ যখনি নিজের সম্বন্ধে নিজে সচেতন হয়, তখন সে নিজের জীবনকে 'অভ্যুদয়'-এর উদ্দেশে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। সেকালে বলা হত গৃহস্থের জীবনে উন্নতির প্রয়াস। শুধু গৃহী নয়, যারা বাল্যকাল থেকে নানা কারণে উদাসী তারাও নিজের মত জীবনের পরিবেশ অনুসন্ধান করত। কেন না, সেই উঠতি বয়সে গৃহী হয়ে জীবিকার সন্ধান করা যেমন ছিল, আবার বৈরাগ্য নিয়ে বস্তুজগৎ ও ভাবের দুনিয়ার পরিচয় নেওয়া শ্রমসাধ্য ছিল। তবে লক্ষ্য ছিল, নিজের কল্যাণ শুধু নয়, অপরের সুখদুঃখের অংশীদার হওয়া।

যেখানে লুকিয়ে থাকে নিঃশ্রেয়সের মূল রহস্য— নিজের ভাল তো জীব ধর্ম। কুকুর, বেড়াল, বাঘ, সিংহ, পশু, পাখি কে না আরাম চায়! তাতে যে সুখবোধ হয়, তার অংশীদার খোঁজে। তাই 'অভ্যুদয়' আর নিঃশ্রেয়স ভারতীয় প্রাচীন জীবনে যমজ। নিঃশ্রেয়স শব্দটাও আজ প্রায় অচল। তা নিজের শ্রেয় লাভ করা নিশ্চিতভাবে। মানুষ বুদ্ধিমান জন্তু— সে তার অতীত যেমন মনে করতে পারে, তেমনি আগামী সম্ভাবনাকেও মনে করতে পারে। সেখানে সে মনে করতে চায়, আমি কি কেবল আমার পরিজন মাত্রকে নিয়ে, না আরো কিছু। নিঃশ্রেয়স হল— সেই আরো কিছুর সন্ধান।

তাই বোধ করি, শাক্য রাজকুমার রাহুলের জন্মের পরই প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, পথের ভিখারী হতে। আজকালকার দিনের ভাষায় নিছক বোকামি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। তবু কিছু লোক আজও নিজেকে নিয়ে এই ধরনের জীবনের খেলা করে। তারা লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে গিয়ে আপনাকে খোঁজার অবকাশ পায়। যেমন করে আরণ্যক জনেরা স্বয়ংভর জীবনে চলে। তাই ভারতে গ্রামীণ ও নাগরিকদের মত আরণ্যক জীবন পাশাপাশি চলে।

তারা কি সমাজের পরগাছা নয়? তাদের খাওয়া পরা আর থাকার ব্যাপারটা

আছে, না নাই। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তারা যখন সেই দুর্গম জীবনযাত্রা বেছে নেয় তখন তারা ঐ সবের কোন কাঙ্খা রাখে না। যেমন করে আজও গভীর অরণ্যবাসীরা দৈবাৎ লোকালয়ে আসে। আজও জৈন দিগম্বর শ্রাবকেরা সাধ্য সাধনা করলে লোকালয়ে আসেন। এখনও কিছু কিছু — সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের বড় একটা পথেঘাটে , রেল স্টেশনে ভিক্ষা করতে দেখা যায় না।

তাঁরা দাবী করেন, তাঁদের বাঁচাবার ভার নিসর্গপ্রকৃতির। সমাজের আর পাঁচজনার খাবারের ভাগ কেড়ে নিয়ে নয়। কারুর কাপড়ের দানের প্রত্যাশা নাই। ভারতীয় জীবনবোধের এক বিপরীত চালচিত্র ধরা পড়ে আজো। তারা নিঃশ্রেয়স পায় বলে দাবী রাখে।

আরণ্যক (আরঞ্চক পালিতে) বৌদ্ধ শ্রমণ

শাক্য রাজকুমার রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আসার পর মগধের তখনকার বিজলিবাতিহীন অন্ধকার পাহাড়ের গুহায়, নদীর তীরে, কখনো বা গভীর অরণ্যে নিজেকে নিজে খুঁজতে চেয়েছিলেন। খুঁজেছিলেন এক সাধারণ কথা— 'মানুষ দুঃখ পায় কেন?' সেই প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে মিলেছিল।

আজকালের এত আরামপ্রদ সমাজনির্ভর মানুষেরা সমাজে একটুমাত্র আত্মসচেতনমাত্র হয়ে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে অবিরাম ছোটাছুটি করে সুখ শান্তির কাঙালপনা করে। মনে চায়, আরো, আরো, আরো— আরো গতি, আরো বেগ, আরো চাওয়া, আরো পাওয়া। দুঃখ মানে খারাপ অবস্থা। 'খ' বাংলা কথার মানে 'অবস্থা'। 'দুঃ' হল খারাপ। 'সু' হোল ভালো। অতএব সুখ তথা ভালো অবস্থা। বিপরীত, খারাপ অবস্থা— দুঃখ।

গৌতম বুদ্ধের আরণ্যক জীবনের অবসান কোনদিন ঘটেনি। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন কপিলবস্তু শালবৃক্ষের তলায়, নিজের হাতের ওপর মাথা রেখে।

এই কি সুখ? রাজার ছেলের একটা বালিশও জোটেনি শেষ শয্যায়?

দরকার কি? নিঃশ্রেয়স জীবনের বোধ সেখানে।

দৃষ্টির ভেদ। গৌতম বুদ্ধের ভাষায় 'সম্যকদৃষ্টি।'

বৌদ্ধ শ্রমণের জীবন শৈলী

গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভের পর সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ বিহার গড়ে ওঠেনি। যে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে তিনি বোধিলাভ করেছিলেন তার থেকে প্রায় দু'মাস পরে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় তিনি প্রথম দেশনা দিয়েছিলেন পাঁচজন পূর্বপরিচিত সহানুধ্যায়ী সঙ্গীকে। কৌণ্ডিন্য, বাস্প, ভদ্রিয়, অশ্বজিৎ এবং মহানাম। তাঁরা আগে গৌতমবুদ্ধের মত

নিসর্গচারী সন্ন্যাসী ছিলেন। অতএব চার প্রকার নিশ্রয়কে নির্ভর করে তাঁদের প্রতিদিনের জীবনধারণে কোন অসুবিধা ঘটেনি।

ধীরে ধীরে গৌতম বুদ্ধের শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে চলেছিল। তখন ঐ চার প্রকার নিশ্রয় ছিল জৈব জীবনের বিধায়ক।

১। ভিক্ষা করে রান্না করা খাবার সংগ্রহ করে খাওয়া। তা যেন কোনমতে মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ না হয়। মধ্যাহ্নকালে শরীরের কোন ছায়া সূর্যের আলোকে পড়ে না। অতএব শরীরের ছায়া দু'আঙুল না-হওয়ার আগে যদি খাবার খাওয়া সম্ভবপর হোল তবেই ঐ সময়ের ভিতর দিনের ভোজন শেষ করা। তা না হলে আর কোন রান্না করা খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

২। শ্মশান বা অন্যত্র পরিত্যক্ত বসন কুড়িয়ে নিয়ে এসে ঐ ছিন্ন চীরবস্ত্র তখনকার পরিশোধনের বস্তু দিয়ে যথাযথ পরিশোধনের পর ছেঁড়া কাপড় টুকরো বিধি অনুসারে সেলাই করা হোত। তার পর গেরুয়া রঙে সেগুলি রাঙিয়ে নিয়ে চীবর তিন খণ্ড দিয়ে মাত্র আবৃত করা হোত।

৩। রাত্রিযাপন বা দিনভাগে বিশ্রামের জন্য বৃক্ষতলে শয্যায় বিরাজ করতো।

৪। ব্যাধি আধি ঘটলে নৈসর্গিক ভেষজ ছাড়াও প্রয়োজনবোধে নিজের মল মূত্র গ্রহণ করার বিধান।

এগুলির নাম একত্রে নিশ্রয় বলা হোত। তার মূল উদ্দেশ্য হল চিত্তের ময়লা অর্থাৎ গৃহীর জীবনে যে বস্তুসম্ভার ভোগে আসক্তি ঘটেছিল সেগুলি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করা। শ্রমণ জীবনের এই মূল কথা।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটে। গৌতম বুদ্ধের মাঝে মাঝে রাজগৃহ (বর্তমান রাজগির) অর্থাৎ বিম্বিসারের তখনকার মগধের রাজধানীতে আসা-যাওয়া ছিল।

ব্যাপারটা রাজা বিম্বিসারের কানে আসে।

রাজগৃহের বেণুবন বিহার

গৌতম বুদ্ধের সঙ্ঘে ধীরে ধীরে ভিক্ষু সন্ন্যাসীর সংখ্যা ষাটের থেকেও পেরিয়ে গেছল। অথচ গৃহত্যাগীদের জীবন চর্যা নিসর্গ নির্ভর হলেও তারা সমাজ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। গৌতম বুদ্ধ তা হয়তো বোধ করেছিলেন।

কিন্তু! কিন্তু কিসের!

সন্ন্যাসীর তো যাঞ্চা নাই নিজের জন্যে। সকালবেলা উঠেই ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে পথে পথে ভোজন যাঞ্চা করতে দোষ নাই, অথচ রাত্রিতে গাছের তলায় শুয়ে থাকতে হয়। আশ্রয় তৈরীর জন্য ভূমি যাঞ্চা করা যায় না!!

'আলয়রামা প্রজা, অনালায়া ধম্মো।' গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী যারা ভিক্ষাব্রতে জীবন কাটায় তাদের পুনশ্চ 'আলয়' তথা 'আশ্রয়' তো মনের আশয়-বন্ধন। তাহলে সদ্যোজাত পুত্র রাহুল, যশোধরা এমনকি বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোদনকে ছেড়ে রাত দুপুরে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়া কেন? বৌদ্ধমতে এসব বিতর্ক— মনের ক্লেশ।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল।

রাজগৃহে গৌতম বুদ্ধ সব সময় থাকতেন না। বৌদ্ধেরা পরিব্রাজক— স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে ঘুরে লোকের হিত ও সুখ বিধানের ব্রত। একবার গৌতম বুদ্ধ সশিষ্য রাজগৃহে আসতে রাজগৃহের রাজা বিম্বিসার তাঁকে সশিষ্য ভিক্ষা গ্রহণের আমন্ত্রণ নিবেদন করেন।

গৌতম বুদ্ধ মৌন থেকে সে সম্মতি দিয়েছিলেন।

আহারাদির পর নিয়মমত গৌতম বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত সকলকে সবার হিত ও কল্যাণের জন্য জীবন জিজ্ঞাসার নানা ধরনের উত্তর, প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাকে 'ধম্মদান' বলা হয়েছে। আরও বলা হয়, 'ধর্মদান' শ্রেষ্ঠ দান। কেননা, ভৌতিক বস্তু, খাদ্য পানীয় ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জৈব জীবনকে পুষ্ট করে। সেগুলি অভ্যুদয়ের পথে বিধায়ক। কিন্তু জীবন জিজ্ঞাসা— কেন আমি এই উৎপাদব্যয়শীল দুনিয়ায়??

গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালে মহাকাশ্যপ আরণ্যক

গৌতম বুদ্ধের সঙ্ঘে নানা ধরনের ব্যক্তির অভাবনীয় সমাবেশ ঘটেছিল। শুধু যে তাঁর উদার ব্যক্তিত্ব ও মহান কল্যাণব্রত ছিল তাই নয়; তিনি সঙ্ঘে সমকালীন নানা — সন্ন্যাস জীবনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। একদিকে যেমন তাঁর কঠোর অনুশাসনের বিরোধী সুভদ্র ও তাঁর অনুগামীরা; অন্যদিকে বাৎসীপুত্রায় ভিক্ষুদের আত্মার বিচার পুদগল বাদ। যার অনুসরণে জন্মজন্মান্তরের সূত্রে 'অন্তরাভব' চৈতাসিক প্রবাহে আস্থা। অপরদিকে মহাকাশ্যপ ধুত সাধনার সন্ধানী ও তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য। এখানে শেষের ধুত সাধনায় যাঁরা নিবিড় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা আরণ্যক বৌদ্ধ শ্রমণ।

বৌদ্ধ ত্রিপিটকে আরণ্যক মহাকাশ্যপ অনেক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। বেশি পরিণত বয়সে গৃহত্যাগ করেন। বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলেন— তাঁর জীবনে নিঃশ্রেয়সের সন্ধানে। শুধু তাঁর নিজের কথা নয়, তাঁর ধর্মপত্নী ভদ্রাকাপিলা(নী) ও অনুরূপা সাধ্বীও ভিক্ষুণী সঙ্ঘে থেরী।

গৌতম বুদ্ধ নিজেও মহাকাশ্যপকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। পালি ত্রিপিটকের অংশ সংযুক্তনিকারে মহাকাশ্যপ প্রসঙ্গ মেলে। মহাকাশ্যপের আরণ্যক শ্রমণ জীবনে গৌতম

বুদ্ধের অনুমোদন ছিল। কেননা, মহাকাশ্যপ ধূতাঙ্গ সাধনায় নিরত থাকতেন। গৌতম বুদ্ধের সায় ছিল। কেননা, মহাকাশ্যপ ছিলেন্ ধ্যাননিষ্ঠ ও লোকানুকম্পাশীল জীবনে অভ্যস্ত।

থেরগাথায় মহাকাশ্যপের নিজের জীবনের যে অভিজ্ঞতার পরিচয় রেখে গেছেন তা অনবদ্য। তাঁর চিত্তসমতার বিবরণে তিনি 'নিঃশ্রেয়স' কি তা জানাতেন। থেরগাথায় তাঁর পালি ভাষায় লেখা অংশের বিবরণ এরূপ—

অরণ্যবাস থেকে আমি একদিন নেমে এলাম। রাজপথে ভিক্ষার সংগ্রহে নিযুক্ত হয়ে দেখলাম এক কুষ্ঠরোগী পথের ধারে আহারে রত। বিনীতভাবে আমি দাঁড়ালাম তার পাশে।

রোগগ্রস্ত ক্ষতবিক্ষত হস্ত বাড়িয়ে, সে আমার ভিক্ষাপাত্রে রেখেছিল খাদ্যকণা। সেই সঙ্গে আমার পাত্রে পড়লো তার আঙুলের এক অংশ বিশেষ যা পরিত্যজ্য ছিল না।

যেহেতু একের উচিত, যা পাওয়া যায় তা নেওয়া। সামান্য একটু খাদ্য, ঔষধ হিসাবে প্রস্রাব, বৃক্ষতলে বাস, (সেলাই করা) জালি দেওয়া পরিত্যক্ত চীবর। বস্তুত সেই লোক সর্বক্ষণ থাকে সন্তুষ্ট। (থেরগাথা সংখ্যা ১০৫৪-১০৫৭)

আরণ্যক ভিক্ষু জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর গাথায় ব্যক্ত। এ (অরণ্য) অঞ্চল অন্তরে আনে আনন্দ। সেথায় লতাগুল্ম তার ফুলের মালা সাজায়, সেথায় শোনা যায় হস্তিযূথের বৃংহতি ধ্বনি (যা শৃঙ্গারের মত ছড়িয়ে পড়ে); আর সেই প্রস্তর সজ্জিত উচ্চস্থান আমার কাছে মনোরম।...

কৃষ্ণবর্ণের মেঘাবৃত প্রস্তর খচিত এই অঞ্চল। যেথায় শীতল, স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী বয়ে যায়, যেথায় জোনাকি তার উজ্জ্বল আলোয় ভরিয়ে দেয়, এই প্রস্তর সজ্জিত উচ্চস্থান আমার কাছে মনোরম।....

শীতল বর্ষার জলে যেখায় প্রস্তর খণ্ড নব সজ্জা নেয়, ঝুঁটিওলা পাখিরা যেথায় কোলাহলে মাতিয়ে রাখে, সন্ন্যাসীরা যেথায় আবাস স্থাপন করে, এই প্রস্তর সজ্জিত উচ্চস্থান আমার কাছে মনোরম।....

যেখান কোন গৃহস্থের অধিকারে নয়, কেবল (হরিণ ছাড়াও অন্য বন্য জন্তু) মৃগদের আনাগোনা, ভিন্ন ভিন্ন বিহঙ্গের সমাবেশে মুখরিত স্থান, এই প্রস্তর সজ্জিত উচ্চস্থান আমার কাছে মনোরম।....

বিস্তৃত গিরিখাতে স্বচ্ছ জলের প্রবাহ পর্যাপ্ত, বানর ও হরিণের বিচরণ ক্ষেত্র, আর্দ্র শৈবালের আস্তরণে ঢাকা সেই অরণ্য। এই প্রস্তর সজ্জিত উচ্চস্থান আমার কাছে মনোরম।....

পঞ্চযন্ত্র সমন্বিত কোন সঙ্গীতের আমন্ত্রণ আমাকে তেমন আনন্দিত করবে না, যেমনভাবে সদ্ধর্মে (বুদ্ধের দেশিত মতে) প্রতিষ্ঠিত আমার এই চিত্ত, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে ঋদ্ধ করবে। (থেরগাথা ১০৬২-৬৩, ১০৬৫, ১০৬৯-৭১; বাংলা রূপান্তর মহাকাশ্যপ, মন্মথকুমার বড়ুয়া লিখিত গ্রন্থর থেকে গৃহীত)।

মহাকাশ্যপ যে আরণ্যক গুহার বিবরণ দিয়েছেন তা রাজগৃহের অনতিদূরে পিপ্ফলী বা পিপ্পলী গুহা। বৈভার পাহাড়ের গায়ে পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে কে যেন সযত্নে গুহাটি বানিয়েছে বলে মনে হয়। তা নয়, প্রকৃতির খেয়াল খুশিতে গৃহত্যাগী আত্মজিজ্ঞাসুদের রোদে তাপে, জলে শীতে কাল কাটানোর আশ্রয়। বলা প্রয়োজন, গৌতম বুদ্ধ নিজে রাজগৃহে থাকার সময় যেমন গৃধ্রকূটের শিখরে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন, তেমনি পিপ্পলী গুহায় তাঁর যাতায়াত ছিল। বলা প্রয়োজন, চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা হিয়ান এবং হিউ এন সাং তাঁদের বিবরণে ঐ গুহার বিবরণ লিখে রেখেছেন। শুধু মহাকাশ্যপ নয়, পরবর্তীকালে বহু আরণ্যক সন্ন্যাসী ঐ পিপ্পলী গুহায় সাধনা করেছিলেন, তা জানা যায়। ইংরাজ আমলে কানিংহামের বিবরণে হিউ এন সাঙের যাত্রাপথের পরিচয় মিলে।

বোধিবৃক্ষ থেকে নিরঞ্জনা নদী পার হয়ে গন্ধহস্তিস্তূপ। তার পাশে এক জলাশয় ও গম্বুজ তিনি দেখেছিলেন। পরিব্রাজক পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হয়ে মো-হো (মোহন) নদী পার হয়ে এক বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ভ পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে উত্তর পূর্ব দিকে একশো লাই প্রায় সতেরো মাইল পার হয়ে কিউ কিউ হু-পোথো (কুক্কুটপাদ) পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঐ পর্বতমালা — তিনটি শিখর বিশিষ্ট ছিল।

কানিংহাম ঐ স্থানটি তাঁর পরিদর্শনের সময় কুর্কিহার নামে পরিচিত জেনেছিলেন। তাঁর মতে ঐটি নিশ্চিত স্থান। গয়া ও রাজগীরের অন্তর্বর্তী স্থান। তাঁর অনুমান কুর্কিহার সম্ভবত কুরক বিহার নামে পরিচিত ছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, কুক্কুটপাদ বিহারের সংক্ষেপিত নামে কুরক বিহার বলে পরিচিত হয়। তাঁর মতে, 'কুক্কুট' সংস্কৃত শব্দটি হিন্দিতে কুক্কর বা কুরক (মোরগ) শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ।

মহাকাশ্যপের আরণ্যক গুহাবাসের বৈচিত্র্য আজও বৌদ্ধমাত্রের অনুপ্রেরণা জাগায়। কেন না, মহাকাশ্যপ বৌদ্ধধ্যানের ক্রমগুলিতে যেমন ধ্যায়ী ছিলেন তেমনি ধূতঙ্গা মার্গে সিদ্ধ ছিলেন।

মূল্যায়ন

আর্থ-সামাজিক বিশ্বজনীন গণবণ্টনের যুগে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেকার আরণ্যক সংস্কৃতির কথা এক ধরনের বুদ্ধিবিলাস। অরণ্যের মানুষকে সমাজের মূল

স্রোতে আনতে হবে। তাই কি? কোনটা মানুষকে উদয়ের পথে নিয়ে যাবে?

তার জন্য কি ফিউচারলজিস্ট উত্তর আসে! প্যালিও জিওলজি ও প্যালিও হিস্টোরিয়ানের হিসাবে ঐ প্রশ্নের উত্তর মিলে কি আজ?

পিছন ফিরে দেখলে যা চোখে ভাসে, গ্রামকে আশ্রয় করে মানুষ যে সমাজ গড়েছে তা দ্বন্দ্ববহুল। অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে মানুষের পরস্পর স্বার্থের সংঘাতে।

অরণ্যের গাছপালা, পাহাড় নদী, সানুদেশ সমতল পরস্পরকে নিয়ে সমঞ্জস। জন্তু জানোয়ারের ভিতর হিংস্রতা খাদ্যখাদক-নির্ভর। বুনো মহিষ ঘাস পাতা খেয়ে বাঁচে। ততটুকুই সেই হিংস্রতা, যতটুকু তার প্রয়োজন। নেউল সাপ খায়, সাপ ব্যাঙ খায়, ব্যাং পোকামাকড় খায়। ততটা যতটা তার প্রয়োজন। খিদে মেটার পর আবার না-খিদে অবধি কেউ কাউকে তাড়া করে না।

আর গ্রাম, শহর, উপনগর, নগর, মেগাসিটিতে যারা, তাদের প্রয়োজনের সীমা কতদূর, তার শেষ অবধি নাই। সাফাই দিতে সমমনস্ক মানবেরা বলেন, 'ওয়ারিং ট্রেটস অফ হিউম্যান' মানুষের আছে বলেই মানব সংস্কৃতি বন-জঙ্গলের সীমা ছাড়িয়ে মেগাসিটিতে। যুধ্যমান মানুষেরা একে অপরকে বাঁচার তাগিদে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে। অরণ্যানী যেখানে বাধা না পায় সে এগিয়ে চলে অবাধ। তাঁর বিকাশ সবাইকে নিয়ে, আশপাশকে ধ্বংস করে নয়। ফলে আরণ্যক সংস্কৃতি প্রাগ্ দ্রাবিড় জন, প্রাগ্ আর্য জন থেকে শুরু করে ভারতের উপদ্বীপে কারা জীবিত। যুগের মানুষেরা যুগের সীমানায় ভারতবর্ষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অরণ্যের কাছে বেঁচে থাকার শিক্ষাপদ মিলে— তা হল সুখে-দুঃখে সহাবস্থান। যা মনুষ্য জাতিজনেরা জানে না। অরণ্যে ভীষণ জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে অধিক হিংস্র। তারই নাম দেয়, মানবের প্রগতি, মানুষের সংস্কৃতি।

পরিশিষ্ট-১

বৌদ্ধ ধ্যান সমাধি ও ধূতাঙ্গের পরিচয়

পালি ভাষায় ধ্যান হল 'ঝান'; নেয়ার্থ মানে হল, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড। বৌদ্ধ সাহিত্যে নীতার্থে বৈদিক শব্দের নেয়ার্থ ভিন্ন। ফলে কি জৈন কি বৌদ্ধ, পরিভাষা অনেক ক্ষেত্রে বিচিত্র ঠেকে। শ্রমণেরা 'ধ্যান' বলতে চিত্তের ময়লাগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া। চিত্তের ময়লা বলতে 'চিত্ত-মল'।

পরে ভারতবর্ষের তন্ত্রশাস্ত্রে নাড়ী-প্রজ্বলন ক্রিয়া মেলে। এমন কি, জ্বলিতা চণ্ডালী ক্রিয়া একাদশ শতকে মর-পা লোকেরা 'ক-গ্যু' তান্ত্রিক যোগ সাধনার প্রবর্তন করেছিলেন। সেই ধারা অনুসরণ করে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ— 'রজকিনী প্রেম নিকষিত

হেম ইত্যাদি। অর্থাৎ কাম (রাগ), দ্বেষ, মোহ, অভিমান বা অহঙ্কার আর সংশয় বা বিতর্ক বৌদ্ধমতে মানুষ মাত্রের চিত্তে মূল ক্লেশ। তাই সে দুঃখ পায়, সুখ পায় না।

(ক) বৌদ্ধেরা ধ্যানের ভিতর দিয়ে সেগুলিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়। তাদের ধ্যানের ক্রম এরূপ—

১। মানুষের চিত্তে বিতর্ক (কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ, কোনটা সুলভ, কোনটা দুর্লভ) থাকে। বিচার (কোনটা সুদাম, সুফলদায়ক, দুষ্কর আদি) ধ্যানের গোড়ায় জাগে। তা সবিতর্ক সবিচার প্রথম ধ্যান।

২। ধীরে ধীরে চিত্তে বিতর্ক ও বিচারের তৎপর অবস্থা কেটে আসে। অবিতর্ক প্রসন্নভাব আসে। তা দ্বিতীয় ধ্যান অবিতর্ক অবিচার।

৩। প্রীতিভাব মনে আরও দৃঢ় হয়, স্মৃতিতে ভেসে ওঠে কতো কতো জানা কথা, প্রকর্ষ জ্ঞানের একটা প্রসাদ ভাব। তা তৃতীয় ধ্যান স্মৃতি সংপ্রজ্ঞান।

৪। স্মৃতি সংপ্রজ্ঞানতা আরও এগিয়ে বলে, সুখদুঃখ, ভালমন্দ, নিন্দাপ্রশংসা বরাবর হয়ে দাঁড়ায়। স্মৃতি তখন উপেক্ষা করে ধ্যানস্থ করে তোলে চিত্তকে। চতুর্থ ধ্যান স্মৃতি-পরিশুদ্ধি।

৫। অনন্ত আকাশ (যাকে স্পেস বলা হয়) চিত্তের ব্যাপ্তিকে বাড়িয়ে তোলে— সীমার ঘেরার বাইরে যেতে চায় চিত্ত— বিষয় বা বস্তুর 'আগ্রহ' থাকে না। 'আগ্রহ' নেয়ার্থে গ্রহণের প্রবৃত্তি। তা পঞ্চম আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানের অবস্থা।

৬। আরও এগোতে এগোতে অনন্ত বিজ্ঞানের আয়তনে চিত্ত বিরাজ করে। তখন বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে চিত্ত।

৭। চিত্তের কিছুমাত্র কাঙ্খা আর শংসা থাকে না। তা হল আকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানের স্তর। চাওয়া না-চাওয়া, পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে চিত্তে কোন আলোড়ন জাগে না।

৮। ধীরে ধীরে ধ্যানীর নিজের চিত্তে ঋদ্ধি-শক্তি লাভ করে— যা সাধারণের কাছে আশ্চর্য (আঃ+চর্য=আচরণ) বলে ঠেকে। শুধু তাই নয়, অপর মানুষজনের চিত্তের ক্রিয়া ধ্যানীর চিত্তে ভেসে উঠতে থাকে। যা অদ্ভুত (মিস্টিক) বলে ঠেকে। ধ্যানী অগ্রসর হতে থাকে যখন তার সংজ্ঞা আছে কি নাই (অসংজ্ঞা) ভাব আসে। তখন 'জ্যান্তে-মরা'— নৈব (ন+এব) সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা (ন+অসংজ্ঞা) অবস্থা। তা অতিমানবীয় বলে ঠেকে সাধারণ মানবের কাছে। তখন ধ্যায়ী দিব্য দৃষ্টি, দিব্য শ্রবণ (শোত্র) ও দিব্য জ্ঞান (ইমরল ভয়েস) পান। এমন কি, সেই অবস্থায় পূর্ব জীবনের বা পূর্ব জন্মের কথা চোখের সামনে ধরা পড়ে। তা দিব্যচক্ষু ও স্বয়ং অভিজ্ঞানে ধ্যায়ীর অধিষ্ঠান।

(খ) ধূতাঙ্গ (পালি ধূতঙ্গ) বা ধূতাঙ্গ ধ্যায়ী শ্রমণের উপযোগী জীবনশৈলী ও ক্রম

অনুসরণ। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় 'ধু' ও 'ধূ' ক্রিয়ামূল বা ধাতুর অর্থ নাড়াচাড়া। তার থেকে ধোওয়া পাখলা (প্রক্ষালন)। বৌদ্ধমতে জনক জননীর তৃষ্ণা-স্পর্শ ও উপাদানের পরপর উৎপাদনের হেতুপ্রত্যয়ে ফল হল মানব শিশুর উদ্ভব। অতএব জনক জননীর যৌথ চিত্তের পুঞ্জীভূত কামনা বাসনার অংশীদার ঐ জাতক। তাকে বলা হয় (জাতকের) চিত্তের সংস্কার।

বৌদ্ধেরা সেই চিত্তের পুঞ্জীপূত সংস্কার ছাড়া মানুষের প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের চেতনা অনুসারে কর্মের থেকে সংস্কার (মনোবিজ্ঞানে অ্যাকশন রিফ্লেক্স) জমা হতে বলে। ধুতঙ্গ বা ধূতাঙ্গ জীবনশৈলী ধ্যায়ীকে বা ধ্যানযোগীকে তার আপন আপন চিত্তের সংস্কার জনিত মল বা ময়লাগুলি ধোয়া-পাখলা বা ধৌতি-প্রক্ষালন বা ধাবন-প্রক্ষালনে সহায়তা করে।

গৌতম বুদ্ধ নিজের জীবনে যে সকল ধূত বা ধৌতি ক্রিয়া করেছিলেন, উত্তরকালে তাঁর শিষ্যদের সমর্থ অনুসারে সাধনক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা চার প্রকার নিশ্রয়ে যা দেখি, তার থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন। বলাবাহুল্য তা নামথ, বিপশ্যনা থেকে পৃথক।

ধূতাঙ্গ বা ধূতাঙ্গের সংখ্যা নিয়ে ক্রমভেদ আছে। কেননা যোগী, যতি ও সন্ন্যাসীরা সকলে চিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য ধূত বা ধৌতি সাধন করেন। হঠযোগীরা চিত্ত ধৌতির আগে দেহ ধৌতি করেন— তা বাইরের স্নান আদি ক্রিয়ামাত্র নয়। দেহের অভ্যন্তর ধৌতি গৌতি ক্রিয়া করা হয়। ধম্মপদে তাই তীর্থক সন্ন্যাসীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ভিতরে মলযুক্ত, বাইরে কেবল পরিমার্জনা, তা নিষ্ফলা।

ধূতাঙ্গের সংখ্যা বৌদ্ধদের মতে চোদ্দটি। যেমন—

১। একাসনিক (এক+আসনিক)— যোগী স্থানচ্যুতি না করে একই আসনে দৃঢ়ভাবে নিজেকে সিদ্ধি না পাওয়া অবধি আবদ্ধ করেন। গৌতম বুদ্ধ বোধিলাভের আগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে একাসনিক ছিলেন।

২। আরণ্যক (পালি অরঞ্ঞিঞক)— অরণ্যে গুহায় বা নিভৃত স্থানে পরিব্রজার অবকাশে বিরাজ করে নিজেকে ধ্যায়ী করা। ফলে বস্তু ও বিষয়ের প্রতি কাঙ্খা ও সংশা থাকে না।

৩। শ্মশানিক (সোসানিক)— শ্মশানে গিয়ে দেহের পরিণাম দেখে রূপ নিরর্থক এই বোধ লাভ করা। নিজের দেহের রূপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণাম ও কায়িক গঠনের অবশেষ কঙ্কাল অবস্থা দেখে অবিতর্ক অবিচারের ধ্যানে চিত্ত স্থাপনে সহায়ক ধূতাঙ্গ।

৪। আভ্রাসাকাশিক (অব্ভোকাসিক)— মুক্ত আকাশের তলায় দিনরাত বসবাস করে ধ্যান সমাপত্তি ছাড়াও দিনমান কাটানো। এটি নিসর্গ প্রত্যয় সাধনক্রিয়ার অঙ্গ।

৫। নৈষাদ্যিক (নেষজ্জিক)— দিনে ও রাতে না শুয়ে অর্থাৎ মেরুদণ্ড ও মেরুরজ্জু উন্নীত করে কায়িক ও চৈতাসিক জাগরণ বা উজাগরভাব।

৬। বৃক্ষমূলিক (রুক্খমূলিক)— বৃক্ষমূলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত ও বসন্ত ঋতুক্রমে জাগরুক চিত্তে বিরাজ করা।

৭। যথাস্তরিক (যথাসম্মতিক)— যেখানে সেখানে শয়নের জন্য আস্তরণ পেতে কোনরূপ শুচি-অশুচি, আরামদায়ক কিনা বিবেচনা বা খুঁতখুঁতে ভাব না রেখে বিশ্রাম।

৮। ত্রৈচীবরুক (তেচিবরক)— তিনটি মাত্র চীবর (চীরখণ্ড), গাত্রবাস অন্তর্বাস ও প্রচ্ছাদ চীবর নিয়ে দিন নির্বাহ করা। বর্ষাকালে ভিজে গেলে, গরমকালে ঘর্মাক্ত হলেও চীবর পরিবর্তনীয় নয়।

৯। পাংশুকুলিক (পংসুকুলিক)— আচ্ছাদন চীবর ধুলোময়লায় পাংশু বর্ণ হলেও তার কোনরূপ পরিবর্তন না করা। চিত্তে বসন আসনে কোন বিক্রিয়া উপশমে স্থির ভাব।

১০। সপদানচারিক (সংস্কৃত ওপালি রূপে অপরিবর্তিত)— ধূতাঙ্গ পালনে কোনরূপ বিরাম দিয়ে একই পদক্ষেপে একবার বেরিয়ে যতটুকু যা মেলে তাতেই সংযত রেখে পিন্ডপাত বা ভোজন গ্রহণ করা। দ্বারে দ্বারে পিন্ডপাত সংগ্রহ করে প্রভূত ভোজ্য না গ্রহণ করা।

১১। নামন্ত্রিক (পালি নানত্তিক)— ভিক্ষান্ন গ্রহণে কোনরূপ চৈতাসিক ভেদ বর্জন করে গ্রহণ করা। মহাকাশ্যপের কুষ্ঠরোগীর কল্যাণের জন্য তার কাছ থেকে ভিক্ষান্ন যৎসামান্য গ্রহণ করার ঘটনা উল্লেখনীয়।

১২। পিণ্ডপাতিক (পালি ও সংস্কৃত শব্দে অভিন্ন) ধূতাঙ্গ ভিক্ষু উপাসক উপাসিকাদের পিণ্ডাকারে অন্নদান ছাড়া অন্য কিছু ভোজ্য গ্রহণে বিরতি।

১৩। পাত্রপিণ্ডিক (পালি পত্তপিণ্ডিক)— ভিক্ষাপাত্রে একবার মাত্র যে পিণ্ডপাত ঘটে তার অতিরিক্ত গ্রহণ না করা। অথবা একবারের অন্নে উদর পূরণ না হলে অন্য পাত্রের অন্ন গ্রহণ না করা। মহাকাশ্যপের থেরগাথায় তা স্পষ্ট।

১৪। খলুপশ্চাদ-ভক্তিক (পালি খলু পঞ্ছাভত্তিক)— দিনরাতে একবারের বেশি ভক্ত (অর্থাৎ ভাত) গ্রহণ না করা। একাহারে দৃঢ় নিষ্ঠা।

এই চোদ্দটি ধূতাঙ্গ/ধুতঙ্গ নিয়ম বৌদ্ধ শ্রমণেরা পালন করেন। ব্যক্তিমাত্রের চিত্তের ক্লেশ (মূল ও সংযোজন) নিয়ামক এক ধূতগুণ সম্পাদন করা। ধূতাঙ্গ পালনের সংখ্যা সর্বত্র এক নয়। তাদের ক্রমও ভিন্ন দেখা যায়।

স্রোতগ্রন্থ

অঙ্গুত্তর নিকায় (পালি, বঙ্গানুবাদ) সুমঙ্গল বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙামাটি ১ম খণ্ড, ১৯৯৪, ২০০৪, ৪র্থ খণ্ড ২০০৫

* বিমল প্রভা (লঘু কালচক্রতন্ত্র টীকা, সম্পাদক জগন্নাথ উপাধ্যায় ২ খণ্ড, সারনাথ ১৯৬০, ১৯৬৫

মহাপরিনিব্বান সুত্তং (বঙ্গানুবাদ) ধর্মরত্ন মহাস্থবির, চট্টগ্রাম ১৯৪১

মসিনম নিকায় (পালি, বঙ্গানুবাদ) ১ম খণ্ড, বেণীমাধব বড়ুয়া, চট্টগ্রাম ১৯৪০; ২য় খণ্ড ধর্মাধার মহাস্থবির, ধর্মাঙ্কুর বিহার, ৩য় খম, বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, কলকাতা

মিলিন্দ পন্থো (পালি, বঙ্গানুবাদ) বিধুশেখর ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৯৩২

পটিসম্ভিদামগ্গ (পালি, বঙ্গানুবাদ) ১ম খণ্ড, জিনবোধি ভিক্ষু, বাংলাদেশ ২০১১

শ্রাবকভূমি (বৌদ্ধ সংস্কৃত), করুণেশ শুক্লা সম্পাদিত, গোরক্ষপুর, ১৯৬৪

সংযুক্ত নিকায় (পালি, বঙ্গানুবাদ) ১ম খণ্ড, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, বাংলা সন ১৪০০; ২ খণ্ড, ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬

** থেরগাথা (পালি, বঙ্গানুবাদ) প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির (ছদ্মনাম স্থবির)

থেরীগাথা (পালি, বঙ্গানুবাদ) ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি সোসাইটি, বাংলা সন ১৩৫৭

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র (বৌদ্ধ সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ) ত্রিস্তরীয় পুণ্ডরীক সূত্র, সরোজকুমার চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১

পরিশিষ্ট ২

অরণ্যের সহচরী ও সহচর— নাগিনী ও নাগ

অরণ্য শুধু বিশাল বিশাল তরুরাজির সমষ্টি নয়, বুনো লতাপাতার আড়ালে বাস করে অগণিত সহচরী ও সহচর। তার কারণ, মরুকান্তারের অরণ্য আর ভারতবর্ষের অরণ্যের পরিবেশ প্রকৃতি এক ধরনের নয়। তা মরুভূমি এমনকি বালুচিস্তানের হিংলাজ দর্শনে যারা গেছে তারা জানে।

আধুনিক ভূ-ত্বক বিজ্ঞানী ও প্রত্ন জীবাশ্ম সন্ধানী বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে যে প্রাচীন যুগের পরিচয় এ পর্যন্ত পেয়েছেন তা অনেকটা এরূপ। — ভূত্বকের নানা বিপর্যয়ের ফলে তা বিচিত্রভাবে গঠিত। ফলে নদ-নদী ভরা পার্বত্য অঞ্চলে যেমন অরণ্যের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি পৃথিবীর স্তরীভূত পালল শিলার কোটি কোটি বছরের ঘাত প্রতিঘাতে নানা অরণ্য আপন আপন স্থান অধিকার করে চলেছে আজও। তাই মানুষের এই ধরনীর বুকে অস্তিত্বর অনেক আগে থেকে অরণ্যের সহচরী ও সহচর নানাভাবে গজিয়ে উঠেছে। তার সেই সুপ্রাচীন কালে আবির্ভাবের পাশাপাশি অগণিত জলচর জীব, উভচর জীব আর শুধু স্থলচর জীব অরণ্যের আপন ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দনে অরণ্য কাউকে অবহেলা করেনি। সবাই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছে। প্রয়োজনে একে অপরকে গ্রাস করেছে আপন আপন অস্তিত্বের প্রয়োগে। গাণিতিক কালসীমার ক্রম এখানে আলোচনার বিষয় নয়। বীজাঙ্কুর আশ্রয়ী অন্তজ জীবেরা কেমন করে জৈবিক ক্রমধারায় বিবর্তিত স্তন্যপায়ী তার গাণিতিক হিসাব প্রাসঙ্গিক নয়।

ভিন্ন জাতের শেওলা নদীর প্রবহমানতা এড়িয়ে নিজেদের জীবন রক্ষা করেছিল অতি অতি আদিকালে। তাদের বিস্তারগতি জলাভূমি ছাড়িয়েও অবাধ অরণ্যের আশেপাশে। ধীরে ধীরে জলচর জীবেরা জলের সীমা ছাড়িয়ে স্থলভূমি অরণ্যের ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তারা প্রায় সকলে অণ্ডজ ছিল। নির্বাধভাবে অরণ্যের আশেপাশে আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে শিখেছে কঠিন জৈব জীবনের সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়ে। স্তন্যপায়ীরাও প্রাচীনদের অনুসরণ করেছে। ভারতবর্ষের পুরাণ গ্রন্থগুলি সেই অতি প্রাচীন যুগের কথা কখনো সরাসরি, কখনো রূপকে গল্প কাহিনীর ভিতর দিয়ে উত্তরকালে সংকলন করেছে— আজকার ভাষা-মীথ বা ওরাল টেলস। তাদের সত্যতা নিয়ে গবেষকরা প্রশ্ন রেখেছেন। তবু তারা ইঙ্গিত বহন করে কোটি কোটি বছরের বুড়ি মা ধরণী। যা ধরে রেখেছে নির্দ্বিধায় কবে থেকে তা এখনো সঠিক জানা যায় না।

ভারতীয় সাহিত্যে অরণ্যানী নিয়ে কৌতূহল জেগেছিল যাঁর মনে তাঁর নাম ছিল 'দেবমুনি'। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সঠিক বলা কঠিন। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৮ সূক্তে তাঁর প্রশ্নগুলির ধরন দেখেই অনুমান করা যায় যে, ঋগ্‌বেদের সমাজ তখন লোকালয় ও অরণ্যে বিভাজিত ছিল।—

"হে অরণ্যানী, তুমি যেন দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্হিত (শেষ খুঁজে মেলে না) তুমি কেন গ্রামে যাওয়ার পথ জানতে চাও না? তোমার কি একা থাকতে ভয় হয় না? কোন জীব বৃষের মত (উৎকট) রব করে, আবার কেউ চিচ্চিক (চি চি রব করে এমন); তারা (বুঝি বীণার) ঘাটে ঘাটে (পর্দায় পর্দায়) অরণ্যানীর মহিমা বলে। (অরণ্যানীর আলো-আঁধারের বিরাজমানতায়) ভ্রম জাগে— কোথাও যেন গাভী চরছে, কোথাও যে অট্টালিকা, সায়ংকালে মনে হয় যেন শকট চলেছে। সায়ংকালে (মনে হয় যেন) গাভীকে আহ্বান করে, আরও যেন কেউ কাউকে অরণ্যানীর ভিতর আহ্বান করছে হিংস্রতায়। বস্তুত অরণ্যানী অহিংসক। কোনো পশু না, অরণ্যে সে আশঙ্কা নাই। সুস্বাদু ফল আহরণ করে সুখে আরণ্যক (বনেচর) অভিলাষ মত দিন কাটায়। সেখানে সুগন্ধগন্ধি সৌরভ (হরিণের মৃগনাভী) আছে। কৃষকেরা তাদের কৃষিকার্য করে না। অরণ্যানী হরিণদের মাতার সদৃশ। (দুর্গাদাস লাহিড়ীর বাংলা অনুবাদের ছায়া অনুসরণে)।

শুধু কি স্তন্যপায়ী বৃষ, মৃগ অরণ্যের সহচর? তারা তো বেশ কয়েক কোটি বছর পরে ধরণীর বুকে এসেছে। তাদের আগে যারা অরণ্যের সহচরী ও সহচর ছিল তারা সর্পিল উভচর সরীসৃপের দল। তাদের অস্তিত্বের পরিচয় অবগত মেরুর চতুষ্পদ জীবদের এই ধরণীর উপর আবির্ভাবের আগে ঘটেছিল তা ভূত্বকবিজ্ঞানী ও প্রত্নজীব বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন। ঐ সরীসৃপেরা কত বিচিত্র গঠনের ছিল সেকথা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে ভরপুর।

জীবমাত্রের বংশ বিস্তারে মাতৃ জাতির মহিমা এই আপেক্ষিত বিশ্বের জীবজগতের এই সত্যনিষ্ঠ রহস্য। তাই বৃক্ষের বীজ অরণ্যের সরস ভূমি কেমন করে বীজপত্র মেলে তার সবটা আজো মানুষের জানা হয়নি। নাগিনীর অগুণতি ডিম থেকে সর্পশিশু বা নাগসন্তান এই ধরনী বুকে আজো সঞ্চরণ করে চলেছে। জনমেজয়ের সর্পনিধন যজ্ঞ একটি রূপক কাহিনী। সর্পিল জীবজগৎ অফুরন্ত এই কথা বলতে। এই নিবন্ধে যে-সকল নাগরাজ ও সর্পিল জীব সরীসৃপের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার মূল স্রোত মহাবুৎপত্তি। তার রচনাকাল ঈশা-উত্তর নবম শতকের মাঝামাঝি। তা ভোটদেশ ও হিমালয়ের উত্তরভাগে তিব্বতের সম্মিলিত ভারতবর্ষীয় আভিধানিক বিদ্বান ও ভোটদেশের ভোট ভাষাভাষী (তিব্বতি ভাষা) বিদ্বানদের যৌথ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর।

প্রশ্ন আসতে পারে, ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষায় অমরকোষ প্রভৃতি অভিধান গ্রন্থে উত্তরকালে পৌরাণিক স্রোতের সংকলন পরিহার করা হয়নি কেন? তার উত্তর স্পষ্ট যে, মহাবুৎপত্তির অভিধানে সংগৃহীত শুধু ভারতবর্ষের স্রোত নয় ভোটদেশ তথা তিব্বতের স্রোতের কিছু কিছু নামাবলী মেলে। তা স্মরণ করতে হবে। মহাব্যুৎপত্তির সংস্কৃত-তিব্বতি দ্বিভাষিক সংস্করণের ইংরাজী অনুবাদ হাঙ্গেরীয় বিদ্বান সোমা-ডি-কোরস প্রস্তুত করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁর জিজ্ঞাসার উদ্ভাবিত সম্পদ দুইটি প্রস্থানে প্রকাশ করে। একটি উনিশ শতকে, অবশিষ্ট অংশ বিশ শতকের চতুর্থ পাদে। শেষ প্রস্থানের সম্পাদক ছিলেন দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০১-১৯০৩), ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের তিব্বতি প্রস্থান নিয়ে নিষ্ঠাশীল গবেষক।

মহাব্যুৎপত্তির তালিকা এরূপ —

(ক) নাগরাজ নামাবলী

১। শঙ্খপাল— শঙ্খ পালনকারী নাগ। সে ইঙ্গিত অন্যত্র দেখা যাবে।

২। কর্কোটক— উভচর সরীসৃপ। তিব্বতী অনুবাদ মতে 'নিজের বল প্রকটক'।

৩। কুলিক— বিশিষ্ট নাগরাজ, নাগকুলের সংরক্ষক।

৪। পদ্ম— তিব্বতী রূপান্তর পদ্ম শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ 'পদ্-ম'।

৫। মহাপদ্ম— উপরোক্ত প্রজাতির বিশালকায় ও উচ্চকোটি সম্পন্ন

৬। বাসুকি— বসু বা সম্পদ ও ভূতিসম্পন্ন (রূঢ়ি অর্থে, তিব্বতী অনুবাদ)

৭। অনন্ত— অন্তহীন শক্তি ও সম্পদের অধিকারী (ঐ)

৮। তক্ষক— (আকাশচারী?), বিষ বর্ষণ করতে সক্ষম (ব্যাল?)

৯। বরুণ— (ঐ?) আকাশপথে জলবর্ষণে সক্ষম (ঐ)

১০। মকর— কুম্ভীর প্রজাতির অন্যতম

১১। লম্বুক— লম্বমান গঠনের প্রজাতি (তুলনীয় ২০)

১২। সাগর— সাগরে বাস করে নাগ প্রজাতি (তুলনীয় ৩৮)

১৩। অনবতপ্ত— (মানস সরোবরের) শীতল জলচর নাগ

১৪। পিঙ্গল নাগরাজ— গায়ের বর্ণ অনুসারে সরীসৃপ প্রজাতির ভিতর শ্রেষ্ঠ।

১৫। নন্দ— অক্ষোভিত (তিব্বতী অনুবাদে তুলনীয় নন্দন ১৭)।

১৬। সুবাহু— শোভন বাহুযুক্ত ব্যাল নাগরাজ।

১৭। চিত্রাক্ষ— উজ্জ্বল অক্ষিসম্পন্ন নাগরাজ।

১৮। রাবণ— ধ্বনি ঘোষক নাগরাজ।

১৯। পাণ্ডুবক (তিব্বতী অনুবাদে) ফ্যাকাশে সাদা বর্ণ নাগ প্রজাতি

২০। লম্বুক— (তুলনীয় ১১ সংখ্যক বিবরণ)

২১। কৃমিক— সর্পিল কৃমি তুল্য (তুলনীয় ৩২)

২২। শঙ্খ— (তুলনীয় ১— শাঁখামুটি?)

২৩। পাণ্ডুরক— (তিব্বতী অনুবাদে ভেদ স্পষ্ট নয়, তুলনীয় ৩২)

২৪। কাল— ঘোর কৃষ্ণবর্ণ (তিব্বতী অনুবাদে)

২৫। উপকাল— অপেক্ষাকৃত হালকা কাল রঙের ভিন্ন প্রজাতি)

২৬। গিরিক— পাহাড়ী সাপ

২৭। অবল— (কর্কোটিক প্রজাতি ভিন্ন) বলহীন নাগরাজ।

২৮। শঙ্কর— তিব্বতী অনুবাদে গৈরিক বর্ণের কুম্ভীরতুল্য প্রজাতি বিশেষ।

২৯। ভাণ্ড— মধুভাণ্ড (সন্ধানী) বিশেষ প্রজাতি।

৩০। পঞ্চাল— প্রাচীন ভারতবর্ষে পঞ্চাল(ক) প্রান্তীয় নাগ।

৩১। কালিক— তিব্বতী অনুবাদে 'সময়-সম্ভব'?

৩২। কিঞ্চক— ক্ষুদ্রাকার সর্পিল প্রজাতি (তুলনীয় ২১)

৩৩। বলিক— (২৭ সংখ্যক 'অবল'-এর বিপরীত?) বলসম্পন্ন।

৩৪। উত্তর— (তিব্বতী রূপান্তরে) শেষ নাগের বিপরীত প্রজাতি।

৩৫। মাতঙ্গ— বন্য বৃহদাকার নিয়ামক বিশেষ প্রজাতি।

৩৬। এলো— নিরীহ স্বভাবের নাগ, (মেষ ঘনিষ্ঠ?)।

৩৭। সাগর— (তুলনীয় ১২) তিব্বতী অনুবাদ 'র্গ্য-ম্ছো' অর্থে সাগর।

৩৮। উপেন্দ্র— মন্ত্র বা ওষধি বশ্য নয় এমন বিষধর প্রজাতি।

৩৯। উপনর— (তিব্বতী অনুবাদে) মানব ঘনিষ্ঠ প্রজাতি (কৃকলাস, টিকটিকি?)

৪০। এলাবর্ণ— (ঐ) মেষ বর্ণযুক্ত।

৪১। চিত্র— মিশ্র বর্ণের উজ্জ্বল গাত্র।

৪২। রাঘব— তিব্বতী অনুবাদে রঘু শব্দের অর্থ বুদ্ধিশীল; প্রজাতি বিশেষ।

৪৩। হস্তিকচ্ছ— হস্তিশুণ্ড তুল্য স্থলকার প্রজাতি বিশেষ।

৪৪। এলা-পশুক— স্বয়ং বিভজ্য (তিব্বতী অনুবাদে) সরীসৃপ প্রজাতি নয়; খণ্ডিত হয়েও স্বয়ংক্রিয় প্রজাতি নাগ।

৪৫। আম্রতীর্থ— (তিব্বতী অনুবাদ সংস্কৃত শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ)।

৪৬। অপালল— স্থূলকার শীর্ণতাহীন নাগরাজ।

৪৭। চাম্পেয়— চম্পা জনপদের নাগ (তিব্বতীতে চম্পা প্রতিবর্ণীকৃত)।

৪৮। অলিক— বর্ণ বৈচিত্র্যের অভাব।

৪৯। প্রমোক্ষক— তিব্বতি শাব্দিক অনুবাদের অর্থ মুক্তক (যত্র তত্র বিচরণশীল)।

৫০। স্ফোটন— দংশনে চর্মস্ফোট ঘটে।

৫১। নন্দ-উপনন্দ/নন্দোপনন্দৌ— (যমজ) তিব্বতীতে প্রতিবর্ণীকৃত।

৫২। হুল্লর— (তিব্বতীতে নামের প্রতিবর্ণীকরণ)।

৫৩। হুলুক— শূল দর্শন (বিবর্ণ বর্ণের গাত্র)।

৫৪। পাণ্ডর— (তুলনীয় ২৩, ১৯, ২৪, প্রজাতি বিশেষত্ব অনুসারে গাত্রবর্ণ ভিন্ন)।

৫৫। অরবাদ— শীর্ণকায়, শ্যাম পাণ্ডুর বর্ণ নাগ বিশেষ।

৫৬। চিচ্ছক (সংস্কৃত শীর্ষক)— শীর্ষ স্থূল প্রজাতি বিশেষ (প্রাক্ পানিনীয় লোকভাষার দৃষ্টান্ত।

৫৭। পরবাড়— প্রশোভন (দেখতে সুঠাম), তিব্বতী রূপান্তর অস্পষ্ট।

৫৮। মণস্বী— তেজশালী খরবিষ প্রজাতি বিশেষ।

৫৯। শব্দ (নাগরাজ)— তিব্বতী অনুবাদে পিঙ্গল বর্ণ ত্বরিত গতিশীল নাগরাজ।

৬০। উৎপল— (তিব্বতী শব্দের প্রতিবর্ণ দেখান হয়েছে) পদ্ম নাগের প্রজাতি?

৬১। বর্ধমানক— (প্রয়োজন বোধে) স্ফীত বা শীর্ণ হতে পারে।

৬২। বুদ্ধিক— তিব্বতী অনুবাদে শাব্দিক অর্থ মিলে।

৬৩। নখক— নখযুক্ত (ব্যাল বা কৃকলাস, গোসাপ?)।

৬৪। এলোমেলো— তিব্বতী অনুবাদে মেঘ ঘনিষ্ঠ নিরীহ প্রজাতি।

৬৫। অচ্যুত— যে প্রজাতি কোন কিছুতে জড়িয়ে থাকে, ছাড়ানো যায় না।

৬৬। কম্বলাশ্বতরৌ (?)— তিব্বতীতে প্রতিবর্ণীকরণ করা হয়েছে।

৬৭। সুদর্শন নাগরাজ— দেখতে সুশোভন (অথচ বিষধর)।

৬৮। পরিস্ফুট— তিব্বতিতে শাব্দিক অনুবাদ স্পষ্ট নয়।

৬৯। সুমুখ— (বিষধর অথচ) অভিরাম দর্শন প্রজাতি বিশেষ।

৭০। আদর্শমুখ— স্বচ্ছ মুখ (আক্ষরিক রূপান্তর মাত্র)।

৭১। গন্ধার— গন্ধার শব্দটি তিব্বতীতে শাব্দিক অনুবাদ। (সম্ভবত দেশীয় নাগরাজ, নাগ প্রজাতি বিশেষ)।

৭২। দ্রাবিড় নাগরাজ— উপরের অনুরূপ দ্রাবিড় দেশীয় নাগ। দক্ষিণ ভারত প্রাচীন ভারতবর্ষের জনগোষ্ঠী। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত গবেষিকা ভক্তি সম্পাদিত তিব্বতী স্রোতে দ্রামিল বিদ্যারাজ দ্রষ্টব্য।

৭৩। বলদেব— (তিব্বতী অনুবাদে) বল সম্পন্ন নাগ প্রজাতি বিশেষ।

৭৪। কম্বল— (তুলনীয় ৬৬) তিব্বতীতে প্রতিবর্ণীকরণ মিলে।

৭৫। শৈলবাহু— হৈম প্রান্তরের নাগ প্রজাতি বিশেষ।

৭৬। বিভীষণ— ভীষণ আকারের বৃহৎ নাগ প্রজাতি।

৭৭। গঙ্গা— (তিব্বতীতে প্রতিবর্ণীকরণ) গঙ্গায় চরমান জলচর নাগ প্রজাতি বিশেষ।

৭৮। সিন্ধু— সিন্ধু নদের জলচর নাগরাজ।

৭৯। সীতা— (তিব্বতী অনুবাদে) সূচাগ্রমুখ শান্ত স্বভাবের নাগ প্রজাতি।

৮০। পক্ষুর— (তিব্বতী অনুবাদে প্রতিবর্ণীকরণ) 'বক্ষু'। বক্ষু প্রাচীন বৈদিক যুগের একটি নদী। এশিয়া মাইনরের বিদ্যমান আমু দরিয়া বলে অনুমান। সেখানের জলচর নাগরাজ।

৮১। মঙ্গল নাগরাজ— (তিব্বতী অনুবাদে) কুশল মঙ্গল। প্রাচীন পরম্পরায় যাত্রাপথে দক্ষিণে সর্প দর্শন শুভ বলে ধরা হয়।

(খ)

মহাব্যুৎপত্তিতে নাগরাজের তালিকা ছাড়াও সর্পিল সরীসৃপের নামগুলি নিচে দেওয়া হল—

১। ইন্দ্রসেন— লক্ষণীয় যে নাগরাজ নয়, নাগরাজের সেনা বিশেষ। তিব্বতী অনুবাদে ইন্দ্রিয় অধিকারী 'ইন্দ্র' (দবং-পো) ও 'ইন্দ্রিয়' দুইই বোঝায়।

২। নড়— তিব্বতী অনুবাদে শরগাছ। শরের মত তীক্ষ্ণ ঋজুকায় সর্প প্রজাতি।

৩। সুন্দর— প্রিয় দর্শনতা আছে (ভয়ঙ্করের বিপরীত) সর্প প্রজাতি।

৪। হস্তিকর্ণ— বিশাল কর্ণযুক্ত (?) সর্পিল প্রজাতি বিশেষ।

৫। তীক্ষ্ণ— তীক্ষ্ণ দংশনের সর্প বিশেষ।

৬। পিঙ্গল— (তু. নাগরাজ সংখ্যা ১৪) সমগোত্রীয় প্রজাতির নিম্নবর্গ সর্প।

৭। বিদ্যুজ্জ্বল— আকাশে দীপ্যমান ব্যাল প্রজাতির সর্প বিশেষ।

৮। মহাবিদ্যুৎ— ঐ প্রজাতির আরও শক্তিশালী সরীসৃপ বিশেষ। (সম্ভবত ভুটান দেশের প্রজাতি?)

৯। ভরুকাছ— পশ্চিম ভারতের কচ্ছ উপসাগর অঞ্চলের প্রজাতি বিশেষ।

১০। অমৃত— গরলহীন সরীসৃপ প্রজাতি বিশেষ।

১১। তীর্থিক— তিব্বতী অনুবাদে 'মু-স্তেগস' শব্দটি সমাসবদ্ধ ভাবে নিলে ভোটদেশ বা তিব্বতের সীমান্ত 'মু' অঞ্চলে সর্পিল প্রজাতি (?)

১২। বৈদুর্য-প্রভ— উজ্জ্বল দীপ্ত প্রভার সর্পিল জীব।

১৩। সুবর্ণ কেশ— লোমশ সরীসৃপ সুবর্ণ বর্ণের প্রজাতি।

১৪। সূর্যপ্রভ— সূর্যের মত প্রভাযুক্ত প্রজাতি বিশেষ।

১৫। উদয়ন— তিব্বতী অনুবাদ স্পষ্ট নয়।

১৬। গজশীর্ষ— দেহের শীর্ষভাগ হস্তি-তুল্য আকারের প্রজাতি বিশেষ।

১৭। শ্বতক— সাদা রঙের সর্প প্রজাতি।

১৮। কালক— কালো রঙের সর্প প্রজাতি।

১৯। যম— খর বিষ দংশনশীল সর্প প্রজাতি।

২০। শ্রমণ— তিব্বতী অনুবাদ 'ভিক্ষু' শব্দের দ্যোতক। (স্পষ্ট নয় এখানে)

২১। মণ্ডুক— কচ্ছপ উভচর জীব বিশেষ।

২২। মণিচূড়— যার চূড়ায় মণি থাকে (তুলনীয় মণিচূড় অবদান)।

২৩। অমোঘ দর্শন— তিব্বতী অনুবাদ অস্পষ্ট।

২৪। ইশাধার— (বাঁকা মুখ) লাঙলের অবয়ব যুকু মুখ যার এমন প্রজাতি।

২৫। চিত্রসেন— রঙীন বর্ণের সর্প প্রজাতি।

২৬। মহাপাশ— তিব্বতী অনুবাদে দীর্ঘাকার সর্পজাতি যা ফণায় দংশন করে না অথচ শরীরের পাশবন্ধনের ফলে রক্ত শুষে নেয়। তুলনীয় রামায়ণে লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন ও হনুমানের বিশল্যকরণী সংগ্রহের পৌরাণিক কাহিনী।

২৭। ক্ষেত্রেংকর— আরণ্যকেরা সম্ভবত শুভকারক সর্পিল প্রজাতি মনে করত? (তিব্বতী অনুবাদে কোন বিশেষত্ব স্পষ্ট নয়)।

২৮। মহাফণক— বড় ফণাযুক্ত সর্প প্রজাতি।

২৯। গম্ভীর নির্ঘোষ— (তুলনীয় রাবণ নাগরাজ ১৮) তিব্বতী অনুবাদে স্পষ্ট যে তাদের গতিবিধির শব্দ অন্য প্রাণীবর্গের কাছে আগেই শোনা যেত।

৩০। মহানিনাদী— (ঐ)।

৩১। বিনন্দিত— তিব্বতী অনুবাদে উপরের দুই প্রজাতির বিপরীত প্রজাতি।

৩২। মহাবিকর্ণ— শঙ্খের ঘোষের মত রব করে এমন প্রজাতি।

৩৩। ভূজঙ্গম— সরীসৃপের ভিতর হস্তযুক্ত বিশেষ প্রজাতি।

৩৪। মহাবল— (তু নাগরাজ প্রজাতির ৩৪)। ঐ প্রজাতির সাধারণ জীব।

৩৫। বিস্ফুর্জিত— গর্জনশীল সর্পিল প্রজাতি।

৩৬। বিস্ফোটক— দংশনের পরিণামে দংশিতের গাত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের স্ফোট (ফোসকা বা চাকা চাকা ঘা) হয়।

৩৭। প্রস্ফোটক— (ঐ)।

৩৮। মেঘসম্ভব— বিশেষ আকাশচারী সর্পিল প্রজাতি (?) তিব্বতী অনুবাদ অস্পষ্ট।

৩৯। স্বস্তিক— তিব্বতী অনুবাদে কল্যাণ সূচক (তুলনীয় ২৭)।

৪০। বর্ষবীর— (তিব্বতী অনুবাদে প্রতিশাব্দিক) আকাশচারী বর্ষণকারী?

৪১। মণিকণ্ঠিক— কণ্ঠদেশে (গলার বাইরের দিকে) মণিযুক্ত। (যাতে মণির উজ্জ্বলতায় কীট পতঙ্গ ছুটে আসে। তারা ভক্ষ্য হয়)।

৪২। সুপ্রতিষ্ঠিত— তিব্বতী অনুবাদে প্রজাতির বিশেষত্ব অস্পষ্ট।

৪৩। শ্রীভদ্র— (ঐ)।

৪৪। মহামণিচূড়ক— (বিশালকায়) বিশাল মণিচূড় প্রজাতি বিশেষ।

৪৫। ঐরাবণ— (তিব্বতী অনুবাদে) ধরণী রক্ষয়িতা (নাগরাজের) পুত্র।

৪৬। মহামণ্ডলিক— মহাকুণ্ডলীযুক্ত সর্প (বুদ্ধগয়ায় মুচলিন্দকার তুলনীয়)।

৪৭। ইন্দ্রায়ুধ শিখী— রামধনু (আঁকা) বর্ণের শিখাযুক্ত প্রজাতি বিশেষ।

৪৮। অবভাসক— শিখী (তিব্বতী অনুবাদে) ভাস্বর সূর্যপ্রভা দীপ্ত ফণা যুক্ত।

৪৯। ইন্দ্রযষ্টি— (তিব্বতী অনুবাদ অস্পষ্ট, তুলনীয় খ ১, ১৭)

৫০। জম্বু-ধ্বজ— তিব্বতী অনুবাদ শাব্দিক প্রতিবর্ণীকরণ)।

৫১। শ্রীতেজ— তিব্বতী অনুবাদে 'তেজ', বল ও দীপ্তি থেকে পৃথক। তেজ ওজো গুণের স্ফুরণে বিরশিত হয়। সর্পিল সরীসৃপ হলেও ভিন্ন ভিন্ন স্ফুরণ এই দুই প্রজাতির।

৫২। শক্তিতেজ— (ঐ)।

৫৩। চূড়ামণিধর— মাথার শীর্ষদেশে মণি ধারণে সক্ষম (প্রাচীন) প্রজাতি?

৫৪। ইন্দ্রধ্বজ— তিব্বতী অনুবাদ অস্পষ্ট।

৫৫। জ্যোতিরস— তিব্বতী অনুবাদে (আগুনের) ফুলকি (বিষ) নির্গত।

৫৬। সোমদর্শন— (বিষধর) চন্দ্র তুল্য সোমদর্শন সর্প প্রজাতি বিশেষ।

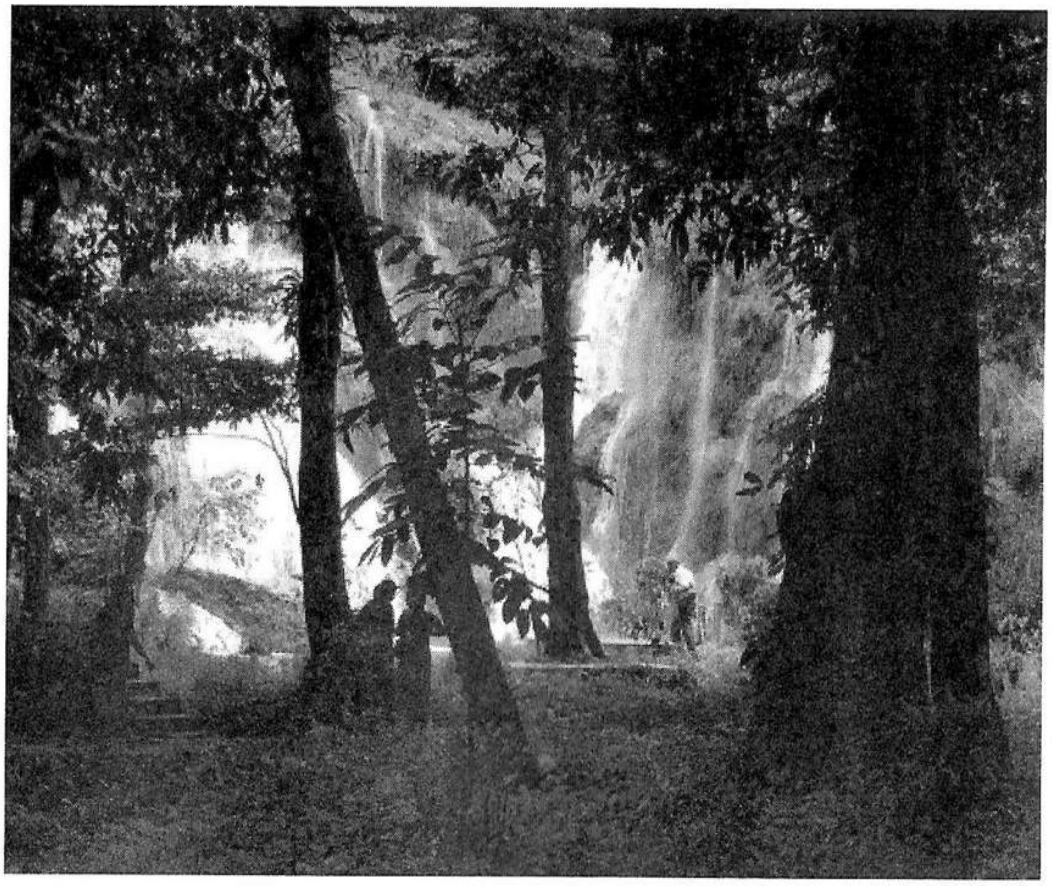

ছবি: অসীম কাঞ্জিলাল